বুলেটিন নংঃ আট
প্রকাশ কালঃ ৮ নভেম্বর '৯৭
শুভেচ্ছা মূল্যঃ পাঁচ টাকা মাত্র

স্বাধিকার

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ মুখপত্র

আপোষ নয়, আসুন লড়াই সংগ্রাম জোরদার করি

॥ রাজনৈতিক ভাষ্যকার ॥

একবার হাসির রাজা গোপাল ভাঁড়ের গরু হারিয়ে মতিভ্রম হয়েছিল। মতিচ্ছন্ন হয়ে নিজের ছেলেকে গোপাল ভাঁড় শালা বলে গালি দেয়। এটা শুনে লজ্জায় ঠোঁট কেটে তার বউ বলে উঠল, 'মানুষের মাথা খারাপ হয় বলে নিজের ছেলেকে কেউ কোনদিন শালা বলে গালি দেয় নাকি'? গোপাল ভাঁড় থতমত খেয়ে অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'গরু হারালে সবার এমন হয়, মা'।

মতিভ্রম হওয়া গোপাল একবার তার ছেলেকে শালা, আবার ক্ষণিক বাদে তার বউকে মা ডাকার ঘটনাটি আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামের নীতি আদর্শহারা কতিপয় রাজনৈতিক ভাঁড়দের কথাই মনে করিয়ে দেয়। গোপাল ভাঁড় যেমন মতিচ্ছন্ন হয়ে কাকে কি সম্বোধন করবে সেটা ঠাহর করতে না পেরে আপন ছেলেকে শালা আর নিজের স্ত্রীকে মা বলে ডেকেছে, অনেকটা ওরকম আজ পার্বত্য চট্টগ্রামেও রাজনৈতিক গোপাল ভাঁড়েরা লক্ষ্য ও আদর্শচ্যুত হয়ে জনগণের শত্রুদেরকে তাদের পরম বন্ধু বলে সম্বোধন করে কোলে তুলে নিচ্ছে, সমাজের ধিক্কৃত ঘৃণিত নিন্দিত টাউট বাটপারদের নিয়ে মহা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে। "ঐকমত্য ঐকমত্য" রলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, প্রকৃত সংগ্রামী দেশপ্রেমিক বন্ধুদেরকে শত্রু বলে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে নানানভাবে ল্যাং মারছে। শাস্ত্রে বলে সৎ সংসর্গে স্বর্গবাস, অসৎ সংসর্গে সর্বনাশ। সংগ্রামের মুখোশ পরা নীতি আদর্শচ্যুত কতিপয় জেএসএস নেতা পার্বত্য চট্টগ্রামের দাগী বদমায়েশ ও দালালদের সাথে লজ্জাকর মিতালী পাতিয়ে দহরম মহরম করে জেএসএস নামের সংগঠনটিকে অধঃপতনে নামিয়ে এনেছে এবং শেষমেষ গোটা জনগণকে সর্বনাশ করার জন্য শাসক গোষ্ঠীর সাথে মিলে আতংকজনক চক্রান্তে মেতে উঠেছে।

সরকারের সাথে ষষ্ঠ বৈঠক শেষে জেএসএস নেতা সন্তু লারমা একুশ সেকেন্ড স্থায়ী প্রেস ব্রিফিং-এ তাকে ধরিয়ে দেয়া এক চিরকূট দেখে ঘোষণা দেন, "খসড়া চুক্তির চুক্তি প্রণীত হয়েছে, আমার সহকর্মীদের সাথে আলোচনার পর পরবর্তী বৈঠকে চুক্তি সই করতে যাচ্ছি"। (দেখুন, দৈনিক আল আমিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর '৯৭ ও একই তারিখের অন্যান্য জাতীয় পত্র পত্রিকা)। অথচ হাস্যকর ব্যাপার এই যে, জেএসএস ৩১শে অক্টোবরের মধ্যেই সরকারের কাছে খসড়া চুক্তি চেয়ে পাঠায়। চুক্তির খসড়া যদি চূড়ান্ত হয়ে থাকে তাহলে তা সঙ্গে না নিয়ে কেন পরবর্তীতে চেয়ে পাঠানো হচ্ছে? গজামিলটা কোথায়? এখানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে, গেল ষষ্ঠ বৈঠকেও চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত হয়নি। সন্তু বাবু জেএসএস -এর হয়ে বৈঠকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার তো সবকিছু জানার কথা। তারপরেও কেন তিনি সেদিন একটা চিরকূট দেখে ঐ রকম ঘোষণা দিতে গেলেন? নোট দেখে যদি ঘোষণা দিতে হয় তাহলে সে নোট তো সরবরাহ করবে জেএসএস -এর অন্যান্য প্রতিনিধিরা। অথচ পত্রিকার সূত্র মোতাবেক (জনকণ্ঠ) সেদিন সরকারের স্পেশাল এ্যফেয়ার্স ডিভিশনের ধরিয়ে দেয়া চিরকূটই সন্তু লারমা পড়েছিলেন। জেএসএস -এর নেতা হয়ে জনগণের প্রতিনিধি সেজে সেদিন তিনি কেন ঐ কাজটি করতে গেলেন? কাকে খুশী করার জন্য তিনি চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত না হওয়া সত্বেও চূড়ান্ত হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন? এখানে আরও সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন দেখা দেয়, যে ব্যক্তি বৈঠকের ফলাফল উপেক্ষা করে ক্ষমতাশালী কারোর মনোরঞ্জন করার লক্ষ্যে সংগঠনের নিয়ম নীতির ধারে কাছে না গিয়ে স্পেশাল এ্যফেয়ার্স ডিভিশনের কর্মকর্তাদের ইঙ্গিতে কাজ করেন, তিনি আসলে কাদের প্রতিনিধিত্ব করেন? সরকারের কৃপা লাভের আশায় যিনি নিজ সংগঠন ও জনগণের দাবি জলাঞ্জলি দিতে পারেন, জনগণের স্বার্থ তুলে না ধরে সরকারের মনোবাসনা অনুযায়ী কাজ করতে ভালোবাসেন, জনগণের কাছে না থেকে যিনি সরকারের কাছে অনুগত থাকেন, তার ওপর জনগণ আস্থা রাখবে কিভাবে??? ডুদুকছড়ায় বৈঠক শেষে "আস্থা রাখুন, আস্থা রাখুন" বলে চিৎকার জুড়ে দিলে তো জনগণ আস্থা রাখতে পারে না। ফুটপাতের ক্যানভাসাররাও নকল ঔষধ ক্রেতাদের হাতে ধরিয়ে দেয়ার জন্য কত কিসিমের আস্থার কথা বলে!!!

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বকোণ ২০শে অক্টোবর সংবাদ ভাষ্য মতে আসন্ন চুক্তিতে স্বাক্ষরের সাথে সাথেই সন্তু লারমা প্রতিমন্ত্রীর মর্যদা লাভ করবেন। প্রতিমন্ত্রীর ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা নিয়েই ঢাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফিরে যাবেন। আর ভারতের ত্রিপুরায় আশ্রিত শরণার্থীদেরকে অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে দীর্ঘ এক যুগ যাবত কষ্টকর জীবন শেষে দেশে ফিরতে হচ্ছে। শুধু ত্রিপুরায় আশ্রিত শরণার্থীদের ভবিষ্যতই অনিশ্চিত নয়, গোটা জাতির ভবিষ্যতও আজ অনিশ্চিত। গেল ৬ই নভেম্বর দিঘীনালার মেরুং এলাকায় বহিরাগতদের দ্বারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বাধানো দাঙ্গায় বেশ কয়েকজন হতাহত ও গুরুতর জখম হয়েছেন। অনেককে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। জাতির আজ প্রশ্ন, কিসের জন্য তাহলে এত বছর জেএসএস জনগণকে সর্বশান্ত করে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন করলো? তাহলে কি পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনটা কেবল মাত্র সন্তু বাবুর প্রতিমন্ত্রীত্ব পাওয়া এবং তার বশংবদ সাকরেদদের সরকারী সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নেয়ার জন্যই? জনগণের এত ত্যাগ তিতিক্ষা রক্ত ক্ষয় কি গুটিকয়েক লোকের আখের গোছানোর জন্যই? এসব প্রশ্নের উত্তর সন্তু লারমা ও তার তল্পিবাহী ব্যক্তিদেরকে জনগণের কাছে দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্যাতিত মানুষকে বোকা মনে করে স্বার্থ হাসিলের গুটি হিসেবে ব্যবহার করার ধৃষ্টতা দেখানোকে দেশপ্রেমিক সংগ্রামী বন্ধুরা কখনো বরদাশত করবেন না।

আসন্ন চুক্তি কিসের ভিত্তিতে হতে যাচ্ছে? ঐ চুক্তির মাধ্যমে কি -

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি মিলছে? ২. নির্যাতনকারী সেনাবাহিনী কি প্রত্যাহার করা হবে? ৩. ভূমি বেদখলকারী বহিরাগতদের কি ফিরিয়ে নেয়া হবে? ৪. জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকার কি নিশ্চিত হবে? ৫. স্বশাসন ব্যবস্থার কি সাংবিধানিক গ্যারান্টি থাকবে?

এর জবাবে সরকার পক্ষ কি বলছে? খোদ প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বার বার বলে যাচ্ছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিরাগত বাঙালি ও সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করা হবে না। সম্প্রতি গত ১৮ই অক্টোবর খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত তথাকথিত পেশাজীবী সমাবেশে কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীও জনগণকে সাক্ষী রেখে একই কথা ঘোষণা করে এসেছেন। সংবিধান পরিবর্তন করা হবে না বলেও সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কাজেই জাতিসত্তার স্বীকৃতি ও স্বশাসনের সাংবিধানিক গ্যারান্টির প্রশ্নই আসে না। তারপর পাহাড়ী জনগণ যে তাদের ভূমি অধিকার ফিরে পাবেন তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং চুক্তির পর ভূমি সমস্যার জটিলতা প্রকট আকার ধারণ করবে বলে আভজ্ঞ মহল আশংকা করছেন। ভূমি সমস্যা নিরসনের জন্য একটি ভূমি কমিশন গঠন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। ঐ কমিশন দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক ভূমি সমস্যার সমাধান করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার সমাধান আসলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার। সুতরাং তা সমাধান হতে হবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের

৯ম পাতায় দেখুন

"শান্তি চুক্তি থেকে পাহাড়ীদের পাওয়ার কিছু নেই"

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তাগণ

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ 'পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হতে যাচ্ছে তা থেকে পাহাড়ীদের আশা করার কিছু নেই। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাতসহ উগ্রজাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলো শান্তি চুক্তি নিয়ে হৈ চৈ করছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। যে শান্তির কথা বলা হচ্ছে তা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

গত ৬ই নভেম্বর গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট কর্তৃক টিএসটি সেমিনার কক্ষে আয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তাগণ এ কথা বলছিলেন।

গণতান্ত্রি বিপ্লবী জোটের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী বদরুদ্দীন উমরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন লেঃ কঃ (অবঃ) কাজী নুরুজ্জামান, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট নেতা ফয়জুল হাকিম লালা, নাট্যকার মামুনুর রশীদ ও পাহাড়ী গণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রসিত খীসা।

কাজী নুরুজ্জামান বলেন, আমরা বর্তমানে আধিপত্যবাদী যুগে বাস করছি। পাহাড়ী জনগণও তার শিকার। কাজেই আসন্ন চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসা দুরুহ। পাহাড়ী ও বাঙালি উভয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। তিনি অচিরেই চুক্তির খসড়া প্রকাশের দাবি জানান।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুজাতিক কম্পানিগুলো যে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান করছে, তার ফলে পাহাড়ীরা আরো বেশি শোষিত হবে। এ ব্যাপারে পাহাড়ী ও বাঙালি উভয়কে সতর্ক থাকতে হবে।

নাট্যকার মামুনুর রশীদ বলেন, এতদিন ভারত জুজুর ভয় দেখিয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ সংকটকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। শান্তিচুক্তি করে যদি পাহাড়ীরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে তাহলে তা হবে খুবই দুঃখের বিষয়। আমরা চাই সেখানে যাতে লোগাং ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। পাহাড়ীদের অধিকার যেন সুনিশ্চিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করে প্রসিত খীসা বলেন, আমরা অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চাই। শান্তি চুক্তির নামে এমন কোন চুক্তি যেন না হয়, যেখানে অশান্তির বীজ লুকিয়ে থাকে। ইদানিং তথাকথিত শান্তি চুক্তি নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে। দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আসলে

৫ম পাতায় দেখুন

স্বাধিকার

বুলেটিন নং ঃ আট, ৮ই নভেম্বর '৯৭

সম্পাদকীয়

মহান নেতা লারমার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

আগামী ১০ই নভেম্বর মহান নেতা এম.এন. লারমার ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৮৩ সালের এদিন জাতীয় কুলাঙ্গার গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র রাতের অন্ধকারে তাকে ও তার অপর আটজন সহযোগীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তারপর শুরু হয় কলংকময় রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ। শুরু হয় ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই। ক্ষয় হয় বহু মূল্যবান সংগ্রামী জীবন। ঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের দল ঠিকতে না পেরে সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়।

এরপর চেঙ্গী-মাইনী-কাচালং-ফেনী-শঙ্খ নদীর পানি অনেক দূর গড়িয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অভাগা মানুষ এরশাদ ও খালেদার দমন পীড়ন ও অত্যাচার নিপীড়নের চরম দুঃসময় পেরিয়ে এসেছে। আন্দোলনের গতিধারায় সময়ের প্রয়োজনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের জন্ম হয়েছে। নিপীড়ন নির্যাতনে জর্জরিত জুম্ম জনতা হতাশার অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসে। আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন, নতুন দিনের স্বপ্ন তাদের মনে জাগরিত হয়। নতুন উদ্যমে অফুরন্ত সাহস ও দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিছিলে শ্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত হয়। দেশে বিদেশে আমাদের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা বাড়তে থাকে। পিছু হটতে থাকে সরকার ও সেনাবাহিনী।

তিন সংগঠনের এই আন্দোলনের পাশাপাশি জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে আপোষ আলোচনা চালাতে থাকে। বিএনপি সরকারের আমলে দফায় দফায় বৈঠক হয়। প্রত্যেক বৈঠক শেষে জেএসএস প্রধান সন্তু লারমা বৈঠককে ফলপ্রসূ আখ্যায়িত করলেও তেমন কোন ফায়দা তিনি করতে পারেননি। বরং বিএনপি জেএসএস'কে বৈঠকের গোলক ধাঁধাঁয় আটকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। লোমহর্ষক নানিয়ারচর গণহত্যায় নিহতদের লাশের উপর দিয়ে তারা সেদিন বৈঠকে গিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর শুরু হয় জেএসএস -এর আদর্শচ্যুত নেতৃগোষ্ঠীর সর্বনাশা আওয়ামী তোষণ নীতি। বৈঠক বৈঠক খেলা আবার জমে ওঠে। সন্তু লারমার সুবিধাবাদী আপোষকামী নেতৃত্ব আন্দোলনের কথা ভুলে যায়। যারা আলোচনার পাশাপাশি সমগ্র জনগণকে সামিল করে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতির কথা বলে তাদেরকে নানাভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে থামিয়ে দেয়া হয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণ পরিষদের দোদুল্যমান অংশকে উস্কে দেয়া হয়। সন্তু লারমা তাদের পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও গণ পরিষদকে অকার্যকর করে দেয়ার জঘন্য অপচেষ্টা চালায়। এসব করার একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারের সাথে তার আপোষের পথ পরিষ্কার করা।

সন্তু লারমার নেতৃত্বে জেএসএস -এর আপোষকামী নেতৃত্বগোষ্ঠী যে পথ গ্রহণ করেছে তাতে তাদের সাথে বর্তমানে সামিল হয়েছে নব্য ও পুরাতন সকল প্রতিক্রিয়াশীল অংশ, সুযোগ সন্ধানী ও ধান্ধাবাজরা। যারা মহান নেতা লারমার হত্যাকারী তারাও আজ তাদের সহযোগী মিত্র। যে দালালদের তারা একদা মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল তাদের সাথেই এখন তাদের মিতালী। সেনাবাহিনীর লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী মুখোশদের সাথেও তাদের দহরম মহরম সম্পর্ক। তাদের সকল ধরণের সুবিধাবাদিতা ও চক্রান্তমূলক কার্যকলাপকে তারা "কৌশল" ও "বাস্তবতা" বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেন।

এম. এন. লারমা জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। তার সেই আকাংখা যে আসন্ন আপোষ-চুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে না তা বলাই বাহুল্য। জেএসএস -এর সংশোধনবাদী নেতৃবৃন্দ বর্তমানে প্রয়াত লারমার লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছেন। আমাদের আন্দোলন নিঃসন্দেহে আজ চরম দুঃসময় অতিক্রম করছে। জুম্ম জনতা আজ এক অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন। এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে প্রকৃত সংগ্রামী দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনকে সঠিক ধারায় নিয়ে আসা। আন্দোলনের বর্তমান সমস্যাটি জেএসএস - পিজিপি বা পিসিপি সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে সুস্পষ্ট দু'টি ধারার- সংশোধনবাদী আপোষকামী ধারা ও প্রগতিমুখী সংগ্রামী ধারা। প্রথম ধারাটি সরকারের সাথে আপোষ করে আন্দোলনকে কানাগলিতে নিতে চায়। এতে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ হাসিল হলেও জনগণের মুক্তি অসম্ভব। অপরদিকে দ্বিতীয় ধারাটি চায় জুম্ম জনগণের প্রকৃত সংগ্রামীদের ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা। আমরা এই দ্বিতীয় ধারাটিরই প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। যে কোন ধরনের অন্যায় অযৌক্তিক আপোষকে, যে আপোষের ফলে জনগণের বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে বন্ধক দিতে হয়, সে আপোষকে তিন সংগঠন কোনদিন মেনে নেবে না।

মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চৌদ্দতম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

রাজনীতি যখন পাঞ্জাবী থেকে কম্বল নীতিতে

-নিদ্রাগুরু নরহরি রাজবৈদ্য

রাজনৈতিক বাটপারদের খুবই প্রিয় উদ্ধৃতি হচ্ছে, "রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু-মিত্র বলতে কিছুই নেই"। এই ভণ্ডামি প্রয়োগ করতে গিয়ে রাজনৈতিক বাটপাররা দুনিয়ায় কতকিছুর যে আশ্রয় নেয় তার ঠিক ঠিকানা থাকে না। তাই এই রাজনৈতিক বাটপারদের নীতি ও আদর্শের কোন বালাই নেই। ফলে তারা এই দুনিয়ায় কার ঘাড় মটকিয়ে সুবিধা আদায় করতে পারবে সেই ধান্দায় মশগুল থাকে। সাধারণ লোকজনকে ঠকাতে পারলে এই বাটপাররা বিশেষ কৃতিত্বের (!) পরিচয় দেন। এরা রাজনীতির বই পুস্তক পড়ার ধারধারে না, মণিষীদের দেয়া সংজ্ঞা বা তত্ত্ব অনুযায়ী চলে না। সেগুলো তাদের দরকারও নেই। বরং সেগুলো তাদের জন্য ঝামেলা ও আতঙ্কের ব্যাপার। তারা দৈনন্দিন চোরাকারবারী ও লাম্পট্য করেই নিজেদের মত করে সুবিধাবাদি নতুন নতুন তত্ত্ব তৈরি করে। যাতে তাদের ধান্ধাবাজী করতে সুবিধা হয়। রাজনীতিতে কখন কবে ঐ শত্রু মিত্র তত্ত্বটি বাজারে ছেড়েছেন বলতে পারবো না, কোন ভোক্তা বা ক্রেতাদের লক্ষ্য রেখে সেটা হয়েছে তাও আমার জানা নেই। তবে আমাদের হরতাল সর্বস্ব হাভাতে দেশের রাজনীতিক বাটপাররা কথাটিকে বেশ লুফে নিয়েছেন। পশ্চিমা দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের ভোক্তাদের উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষতিকর পণ্য ছেড়ে মুনাফা হাতিয়ে নেয়। আমাদের দেশের রাজনৈতিক বাটপারদের জন্য ঐ তত্ত্বটিও তাই হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক বাটপাররা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য হাসি মুখে খুনীর সাথেও হাত মিলান। তাই দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে দাবীদার আওয়ামী লীগ প্রধান হাসিনার সাথে বাংলাদেশের আজন্ম শত্রু গোলাম আজমের হাস্যোজ্জ্বল ছবি। অথবা বিশ্ব বেহায়া এরশাদের সাথে দহরম মহরম সম্পর্ক।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর পার্বত্য রাজনীতিতেও ঐ ভণ্ডামিপূর্ণ তত্ত্বের ফলশ্রুতিতে শত্রু-মিত্রের ধারণা পাল্টে গেছে। পঁচিশ বছর ধরে যেসব দালাল, বাটপার, প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয় শত্রু হিসেবে চিহ্নিত ও ঘৃণিত হয়ে আসছে আজ তারাই জেএসএস -এর প্রধান রাজনৈতিক মিত্র, কলিজার টুকরা। তাহলে কার স্বার্থে এই ২৫ বছরের রক্তক্ষয়? কিসের আশায় ও নেশায় জেএসএস-এর এই পথ পরিবর্তন? তবে কি জেএসএস দীর্ঘ ২৫ বছর ভুল পথে চলেছিল? আসলে কোন নেশাও নেই, আশাও নেই। স্রেফ দেশ প্রেম! বৃহত্তর স্বার্থ। কারণ রাজনীতিতে কোন স্থায়ী শত্রু মিত্র নেই। তাই পছন্দমত শত্রু মিত্র বাছাই করা যায়। তাই বলে দালাল বাটপারের সাথে হাত মেলানো! তাতেই বা কি! হাসিনা যদি গোঃ আজমের রাজনৈতিক মিত্র হতে পারে তবে দালালরাও জেএসএস -এর মিত্র হতে পারে। তাহলে আওয়ামী লীগ আর জেএসএস -এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

পার্থক্য নেই বলেই জেএসএস ও সরকারের মধ্যে বৈঠকে বিশেষ কোন মত পার্থক্যও দেখা দেয়নি। এবং উভয় পক্ষই নিজস্ব বিশেষ কৌশল (তত্ত্ব) অনুসরণ করে সমাধান সূচক বিন্দুতে মিলিত হতে পেরেছে। এই সমাধান প্রচেষ্টায় উভয় পক্ষই সফল - সরকার পক্ষ বিশেষ কোন ছাড় না দিয়ে আর জেএসএস বিশেষ কিছু ছাড় দিয়ে। আলোচনায় (বৈঠকে) সরকার পক্ষের কৌশল হল 'পাঞ্জাবী কূটনীতি' এবং জেএসএস পক্ষের কৌশল 'ফলপ্রসূ ডিপ্লোমেসি'। বিশ্ব রাজনীতিতে এই দু'টি কৌশল বা তত্ত্বই নতুন ও সদ্য আবিস্কৃত। আবিস্কারের কৃতিত্ব দুই প্রধান ব্যক্তিত্বের। যথাক্রমে বাংলাদেশ সরকার প্রধান হাসিনার ও জেএসএস প্রধান সন্তু লারমার। নিম্নে সদ্য আবিস্কৃত তত্ত্ব দু'টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলঃ

উদ্ভবঃ সরকার ও জেএসএস -এর মধ্যে বৈঠকের আনুষ্ঠানিকতা বা প্রাথমিক পর্যায় শেষে হাসিনা বিপক্ষীয় প্রধানকে পাঞ্জাবী উপহার দিয়ে তার কূটনীতি শুরু করেন। এরপর পরই আলোচনা গভীরে প্রবেশ করে। সন্তু লারমার ফলপ্রসূ ডিপ্লোমেসি অবশ্য কিছুটা পুরোণো। খালেদার আমল থেকেই তিনি এই কূটনীতি অনুসরণ করে আসছেন। খালেদার আমলে সরকারের সাথে প্রথম বৈঠক শেষেই তিনি হাসিমুখে 'বৈঠক ফলপ্রসূ' বলে তার কূটনীতি শুরু করেন।

পাঞ্জাবী কূটনীতিঃ

সংজ্ঞা- কোন বিরাজিত জাতীয় সমস্যা সমাধানের মহৎ লক্ষ্যে প্রতিপক্ষীয় দল প্রধানকে দেশীয় খদ্দের কাপড়ের পাঞ্জাবী প্রদান করে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন পূর্বক মগজ ধোলাই করে বাগে আনার পদ্ধতিকে 'পাঞ্জাবী কূটনীতি' বলে।

বৈশিষ্ট্য- এই কূটনীতি পাঞ্জাবী প্রদানের মাধ্যমে শুরু করতে হয়। দুষ্কৃতিকারী ও দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত সশস্ত্র গেরিলা আন্দোলন ধ্বংস করতে এই কৌশল অত্যন্ত কার্যকরী ও ফলপ্রসূ। প্রতিপক্ষের সাথে মাত্র ৬/৭ টি বৈঠকেই চূড়ান্ত ফলাফল অর্জন করা যায়। কবিরাজী ভাষায় বলতে গেলে এই কৌশল বা তত্ত্ব "স্বপ্নে প্রাপ্ত ধন্বন্তরী বটিকার ন্যায় ক্রিয়াশীল"। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা এই কূটনীতি প্রয়োগ করে দীর্ঘ ২৫ বছরের বিদ্রোহী জেএসএস -কে সহজে ব্যাগিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

ফলপ্রসূ ডিপ্লোমেসী

সংজ্ঞা- প্রতিপক্ষের সাথে ধারাবাহিক 'ফলপ্রসূ' বৈঠকের মাধ্যমে দাবি আদায়ের নামে ক্রমাগত আপোষের দিকে অগ্রসর হয়ে চুক্তিতে পৌছানোর কৌশলকে 'ফলপ্রসূ ডিপ্লোমেসী' বলে।

বৈশিষ্ট্য- 'বৈঠক ফলপ্রসূ' হয়েছে মন্তব্য দিয়ে এই কূটনীতির শুভ সূচনা করতে হয়। এই তত্ত্বে কোন ব্যর্থতা নেই । দ্রুত ও নিশ্চিত ফলাফল লাভ করা যায়। প্রতিপক্ষের কাছে অস্ত্র জমা দিতে হয় এবং ৮০ ভাগ দাবি পরিত্যাগ করতে হয়। এই তত্ত্ব প্রয়োগকালে মাঝে মধ্যে 'গুলতি মেরে স্বায়ত্তশাসন আদায় করা যায় না, জঙ্গী আন্দোলন করা যাবে না' এ রকম বক্তব্য প্রদান করতে হয়।

এই 'ফলপ্রসূ ডিপ্লোমেসী' প্রয়োগ করে জেএসএস প্রধান সন্তু লারমা পাঁচটি দাবির মধ্যে চারটি পরিত্যাগ করে প্রবল প্রতিপক্ষ হাসিনাকে ঐকমত্যে আনতে পেরেছেন। নিজের জন্য অনেক সুবিধা আদায় করতে পেরেছেন। চুক্তিতে স্বাক্ষরের সাথে সাথেই আলাউদ্দীনের আশ্চার্য প্রদীপের যাদুকরী কায়দায় 'প্রতিমন্ত্রীত্ব' লাভ করে পতাকাবাহী গাড়ীতে ফিরতে পারবেন। এখন আর শান্তিসেনারা নয়, কাউখালী লোগাং লংগদুতে কসাই বাহিনী ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টই তার নিরাপত্তা বিধান করবে। বিটিভি'র সাদেক আলীর ভাষায় বলতে হয়, "দেশ জাতি আন্দোলন যারে যাগ্ গা- হালুয়া রুটি সুযোগ সুবিধা আয়রে আগ্ গা"।

এদেশের ঐতিহ্য অনুযায়ী শীত মৌসুমে রাজনীতির মাঠ গরম হয়ে উঠে। নিরন্ন হাড় জিরজিরে শীতার্ত মানুষগুলোকে শীতবস্ত্র দিতে

৫ম পাতায় দেখুন

একটি দেশপ্রেমিক রেজিষ্ট্রেশন অফিসের কাহিনী

-স্যাটায়ার চাকমা

ইদানিং দেশপ্রেমিকের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশপ্রেমিকে কিল বিল করিতেছে। অবাক হইবার বিষয় এই যে পুর্বে যাহাদের রেকর্ড জঘন্য খারাপ ছিল তাহারাও আজ খুব ভালো দেশপ্রেমিক হইয়াছে। যাহারা প্রত্যহ ক্যাম্পে গিয়া তথ্য সরবরাহ করিত তাহারাও এখন দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট পাইয়া সদম্ভে পদচারণা করিতেছে। সমাজে যাহারা নানা আকাম কুকাম করিয়া বেড়াইত এবং এখনও করিয়া বেড়াইতেছে তাহারাই এখন সমাজের দেখভাল করিবার দায়িত্ব লইয়াছে। সকল ধরনের সুবিধাবাদী লম্পটরাই এখন জুম্মদের আন্দোলনের নেতা সাজিয়াছে এবং তাহাদের কথায় আন্দোলনের চাকাটি চলিতেছে। দিন দিন এই দেশপ্রেমিকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। আগামী বৈঠকে চুক্তি হইবে শুনিয়া অনেকে তাড়াতাড়ি দেশপ্রেমিক হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কারণ, তাহাদের মতে শান্তিচুক্তির পর আর দেশপ্রেমিক হইবার সুযোগ হইবে না। এই জন্য তাহারা দেশপ্রেমিক হইবার মোক্ষম সুযোগটি হাতছাড়া করিতে রাজী নহে।

এদিকে দেশপ্রেমিকের সংখ্যা অতিদ্রুত বাড়িয়া যাওয়ায় সাধারণ পাবলিক ভাবিতে লাগিল - হেতু কি? এমন কোন দেবতূল্য নেতা কি অভাগা জুম্মদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, অল্পকালের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশপ্রেমের জোয়ার বহিয়া যাইতে শুরু করিয়াছে? প্রথম প্রথম অনেকে মনে মনে এতে খুশীও হইলেন। মনে মনে ধন্য ধন্য বলিলেন। কিন্তু পরে যখন আসল ব্যাপারটি জানিল তখন...। থাক, সে কথা পরে বলা হইবে।

যাই হউক, এই দেশপ্রেমের প্রবল ঢেউ ভক্তিচানের বাড়িতেও বুনো জলের মতো ঢুকিয়া পড়িল। একদিন ভক্তিচানের বউ তার পাশের বাড়ির বান্ধবীর বাসায় বেড়াইতে গিয়া সেখানে নানান দেশপ্রেমের কথা শুনিল। তার বান্ধবী বলিল আমীষবাবুওতো এখন দেশপ্রেমিক হইয়াছে এবং প্রত্যেক বৈঠকে মাল কামাই করিতেছে। ভক্তিচানের বউ মনে মনে ঠিক করিল চন্দ্রমুখী ফা'কে (বাবা) এ কথা বলিতে হইবে। সেদিন রাতেই ভক্তিচানের স্ত্রী ভক্তিচানকে পানের খিলি চিবাইতে চিবাইতে বলিল, 'সারা জীবন ধরিয়া ত জাতির জন্য অমঙ্গল কাজ করিলে, কত নিরীহ লোকজনকে শান্তিবাহিনী বলিয়া ধরাইয়া দিয়া অর্থ কামাই করিলে, এবার ত তারও কোন সুযোগ নেই। এখন দিন বদলাইয়া গিয়াছে। এখন দেশপ্রেমের যুগ। তোমার মত এখন অনেকে দেশপ্রেমিক হইতেছে। তোমারও এ সুযোগ হাত ছাড়া করা ঠিক হইবে না।'

ভক্তিচান বলিল, সেও শুনিয়াছে এরশাদের মত হাসিনা বিবিও জুম্মদের জন্য কি যেন একটা পরিষদ দিবে। এখন রাতারাতি সবাই শান্তিবাদী হইয়া উঠিয়াছে। তার মত অনেকে দেশপ্রেমিকদের দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। কারণ স্পাইগিরিতে ব্যবসা এখন খুবই মন্দা চলিতেছে। তাই ব্যবসা পরিবর্তন না করিয়া উপায় নাই।

সেদিন রাতে বউয়ের কথা শুনিয়া ভক্তিচানেরও খায়েশ জন্মিল সেও দেশপ্রেমিক হইবেই হইবে। কিন্তু কিভাবে দেশপ্রেমিক হইতে হয় তাহা সে জানে না। একদিন কার কাছ থেকে যেন শুনিল, কোন একটা অফিস হইতে নাকি দেশপ্রেমিক সার্টিফেকেট দেওয়া হয়। ভক্তিচান বাবু বহু কষ্টে সেই অফিসের ঠিকানা জোগার করিল। একদিন খুব ভোরে উঠিয়া প্রাতঃ কম্মাদি সারিয়া ছাতা একটা বগল দাবা করিয়া ভক্তিচান দেশপ্রেমিক সনদ পত্র জোগার করিবার উদ্দেশ্যে ডুদুক ছড়ার দিকে পা বাড়াইয়া দিল।

দেশপ্রেমিক রেজিষ্ট্রেশন অফিস ডুদুকছড়াতেই অবস্থিত। অবশ্য ইহা অস্থায়ী কার্য্যালয়। স্থায়ী কার্য্যালয় কোথায় তাহা কেহ জনে না। বা জানিলেও কেহ তাহা বলে না। জানা যায় ঐ স্থায়ী কার্য্যালয়ে নাকি সকলে যাইতে পারে না। দেশপ্রেমিক রেজিষ্ট্রেশন অফিসের মহাপরিচালক কর্তৃক নিয়োগকৃত 'মহান দেশপ্রেমিক এজেন্টদেরই' একমাত্র সেইখানে প্রবেশাধিকর রহিয়াছে।

ডুদুকছড়া পৌঁছিয়া ভক্তিচান বাবুর রেজিষ্ট্রেশন অফিসটি খুঁজিয়া পাইতে তেমন অসুবিধা হইল না। বড় একটি গাছের দেওয়ালে অফিসের সাইনবোর্ড ঝুলিতেছে।

"দেশপ্রেমিক রেজিষ্ট্রেশন অফিস
ডুদুকছড়া
স্থাপিতঃ ১৫ জুন, ১৯৯৫ ইং"

অফিসে গিয়া দেখিল, তাহার মত অনেকেই দেশপ্রেমিকের সার্টিফিকেট পাইবার জন্য ভিড় জমাইয়াছে। যেন মাছের বাজার বসিয়াছে। কেহ ফরম সংগ্রহ করিতেছে। কেহ পুরণ করিতেছে। কেহবা জমা দিতেছে। আবার কেহ শুধুমাত্র ফরম সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছে, পরে আসিয়া জমা দিবে বলিয়া। ভক্তিচান বাবুও লাইনে দাঁড়াইয়া অনেক কষ্টে একখানা ফরম বিনামূল্যে সংগ্রহ করিল। মনোযোগের সহিত তাহা পুরণ করিয়া জমাও দিল। অফিসের বাবুটি তাহাকে এক সপ্তাহ পরে আসিতে বলিল। ভক্তিচান বাবু ভক্তিতে গদ গদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সার্টিফিকেট মিলিবে তো'?

অফিসের একজন কেরাণীর সহিত কথা বলিয়া ভক্তিচান জানিতে পারিল যে, রাঙ্গামাটিতে অফিসের বড়বাবুর (মহাপরিচালক) নাকি এক নিকট আত্মীয় থাকেন। নাম বিলাস বাবু। বিলাস দেওয়ান। অবশ্য দেশপ্রেমের কাজে এখন সে প্রায়শঃ খাগড়াছড়িতে থাকে। তাহার সুপারিশ জোগার করিতে পারিলে কাম হইবে। ভক্তিচান মনে মনে বলিল, যে করিয়াই হোক তাহাকে ধরিতে হইবে। প্রয়োজনে তৈল মর্দন করিতে হইবে। দক্ষিণা লাগিলেও দিতে রাজী। তবুও দেশপ্রেমিক হইতে হইবে।

যেই কথা সেই কাজ। শেষ মেষ ভক্তিচান বিলাস বাবুকে ধরিল। বিলাস বাবুও তাহাকে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা। সে মনে মনে বলিল, 'আরও একখান দেশপ্রেমিক পাওয়া গেল। এইভাবে লোকে দেশপ্রেমিক হইলে দেশ উদ্ধার হইতে বেশী দেরী লাগিবে না'।

ভক্তিচান বলিল, সে দেশপ্রেমিক হইতে চায়। কিন্তু তাহার রেকর্ড ভালো নয়। সে আর্মিদের পক্ষে অনেক কাজ করিয়াছে। এমন কি রেজিষ্ট্রেশন অফিসকেও একসময় গালমন্দ করিয়াছে।

বিলাস বাবু বলিল, কোন অসুবিধা নাই। এই জন্যে তোমার মত কতজনকে দেশপ্রেমিক বানাইয়াছি, কতজনকে যে দেশপ্রেমিকের মহামূল্যবান সার্টিফিকেট জোগার করিয়া দিয়াছি- তাহার কোন হিসাব নাই। অভাগা জুম্ম জনগণের মুক্তির জন্য তোমাদের মত লোকদেরকেইতো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই এখন আমাদের রেজিষ্ট্রেশন অফিসের কৌশল। তাহা ছাড়া, আমাদের বস অর্থাৎ দেশপ্রেমিক রেজিষ্ট্রেশন অফিসের মহাপরিচালক বলিয়াছেন, দালাল দি গ্রেট সমীরণেরও দেশপ্রেম আছে। অর্থাৎ আমাদের বসই প্রথম ও একমাত্র নেতা যিনি দালালদের মধ্যেও দেশপ্রেম আবিস্কার করিয়াছেন।

ভক্তিচান বাবু আরও জানিল যে, দেশপ্রেমিকের রেজিঃ করাইতে পারিলে মাসে মাসে ভাটা এবং অন্যান্য সুবিধাও জুটিবে। কাজ তেমন নাই। শুধুমাত্র 'পরহিত' নামে এক লোক আছে তাহাকে বকিতে হইবে। কারণ সে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের কথা বলিতেছে। আন্দোলনের কথা বলিতেছে। ভক্তিচান বাবু ইহাও জানিল, তবে কিছু সময় পরে, যে, দেশপ্রেমিক সার্টিফিকেট থাকিলে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে এমনকি মুখোশদের আস্তানায়ও যাওয়া যাইবে। তবে ইহা লোকচক্ষুর আড়ালে হওয়া ভাল। কারণ সাধারণ মানুষ দেখিলে দেশপ্রেমের তেজ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তাই সতর্কতার এই ব্যবস্থা। দেশপ্রেমিক সার্টিফিকেট থাকিলে একই সাথে পাঁচ দফা সমর্থন ও আওয়ামী লীগ করা যায়। ইহাতে কোন দ্বন্দ্ব নাই, যদিও আওয়ামী লীগের স্বার্থ ও জুম্মদের স্বার্থ এক নয়। মোট কথা হইতেছে, রাতের বেলা যাহা ইচ্ছা করা যাইবে; মদ, জুয়া ও অন্যান্য হারেমে মশগুল থাকিলেও কোন অসুবিধা নাই, তবে দিনের বেলায় অবশ্যই দেশপ্রেমের মন্ত্র জপিতে হইবে।

যাহাই হউক, যে কথা বলিতেছি, বিলাস বাবুর কল্যাণে সার্টিফিকেট জোগার করিতে ভক্তিচানের কোন অসুবিধা হইল না। দক্ষিণা বা তৈল মর্দন কিছুই করিতে হইল না। সার্টিফিকেটে যাহা লেখা ছিল তাহা এইরূপঃ

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত বাবু ভক্তিচান পীং... সাং....একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। তাহার অতীত ও বর্তমান কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এই সনদ পত্র প্রদান করা হইল। জুম্ম জনগণ তাহার আদেশমত কাজ করিতে বাধ্য থাকিবে।

আমি তাহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

নিবেদক-
গান্দু মারলা
মহাপরিচালক
দেশপ্রেমিক রেজিষ্ট্রেশন অফিস

এই সনদ পত্র পাইয়া ভক্তিচানকে আর ধরিয়া রাখে কে? তাহার শরীরে যেন পাখা গজাইয়াছে। সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সে চষিয়া বেড়াইয়া জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম বিলাইয়া দিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে এলাকায় এলাকায় মিটিং ডাকিয়া লোকজনকে দেশপ্রেমের অমর বাণী শুনাইয়া, আওয়ামী লীগ জেএসএস -এর মিলন গাঁথা ও শান্তির কীর্তণ গাহিয়া ভক্তিচান বেড়াইতে লাগিল। স্বাধিকারের বিরুদ্ধেও গালমন্দ করিল এবং নির্দেশ জারী করিলঃ "এইবার হইতে আর কেহ স্বাধিকার পত্রিকা পড়িতে পারিবে না। স্বাধিকারের নামও মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবে না"। জাতীয় ঐক্যের তত্ত্বও ভক্তিচান প্রচার করিল। সাধারণ মানুষ জানিতে চাহিল, "কার বিরুদ্ধে ঐক্য? কি জন্য ঐক্য? 'জেএসএস' তো আর্মিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করিয়াছে। আওয়ামী লীগের সাথেও বুঝাপড়া হইয়াছে। আন্দোলন করা যাইবে না এই মর্মেও হুকুমনামা জারী করা হইয়াছে। শত্রু ছাড়াতো ঐক্য হইতে পারে না। তাহা হইলে জেএসএস কার বিরুদ্ধে ঐক্যের কথা বলিতেছে? কাহাকে সে শত্রু মনে করিতেছে?" ভক্তিচান এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। চোখ মুখ লাল করিয়া বলিল, তোমাদের এত সাহস! আমার কথার উপর কথা! কোন প্রশ্ন করা যাইবে না। আমরা যাহা বলিব তাহাই তোমাদের করিতে হইবে।

এদিকে রেজিষ্ট্রেশন অফিস হইতেও জনগণের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারী হইল। বলা হইল, দেশপ্রেমের সার্টিফিকেটধারীদের কথামত চলিতে হইবে। না হইলে সমূহ বিপদ ঘটিবে। কাউকে আন্দোলন করিতে হইবে না। সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে দেশপ্রেমিকের হার বাড়াইলেই অভাগা জুম্মদের মুক্তি আসিবে। এজন্য সবাইকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতেও বলা হইল।

সার্টিফিকেটধারী দেশপ্রেমিকদের দেশপ্রেমের অমর বাণী শুনিতে শুনিতে সাধারণ মানুষের কান ঝালাপালা হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। আর সার্টিফিকেটধারীরা সেনাবাহিনীর অফিস ও রেজিঃ অফিস এই উভয় দিক হইতে মাল কামাই করিতে লাগিল।

অতঃপর একটি ঘটনা ঘটিল। ভারত হইতে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীরা তাহাদের জমি ফিরিয়া না পাইয়া আন্দোলন করিতে বাধ্য হইল। তাহারা সভা সমাবেশ করিল। সড়ক বন্ধ করিয়া দিয়া সারা এলাকা অচল করিয়া দিল। পুলিশ তাহাদের লাঠিপেটা ও গ্রেফতার করিল। ইহাতেও তাহারা দমিয়া গেল না। স্বাধিকার পত্রিকা এই আন্দোলনে সমর্থন দেওয়ার ফলে আন্দোলন আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। কিন্তু তবুও সার্টিফিকেটধারী দেশপ্রেমিকদের দেখা মিলিল না। উপরন্তু তাহারা আন্দোলন থামাইবার জন্য পুলিশদের সাহায্য করিল। ভক্তিচান ও বিলাস বাবু জুম্ম শরণার্থীদের ডাকিয়া হুমকি দিল। জনগণ ইহাতে রাগে চটিয়া গেল এবং তাহাদের দুই জনকে আচ্ছা করিয়া গণধোলাই উপহার দিল। তাহাদের ভূয়া দেশপ্রেমিক সার্টিফিকেটগুলিও ছিঁড়িয়া ফেলিল। জুম্ম শরণার্থীদের মধ্যে একজন বলিল, ইহারা আসল দেশপ্রেমিক নহে। ইহারা ভণ্ড, দুই নাম্বারী দেশপ্রেমিক। তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন অফিসও ভূয়া। ইহাদের জন্যই আমাদের এত দুর্গতি হইতেছে। আন্দোলনও ঘুরপাক খাইতেছে।

এই কথা শুনিয়া সকলে বজ্রকণ্ঠ হইয়া উঠিল, বলিল, "অনেক হইয়াছে, আর সহ্য করিব না। দেশপ্রেমের নামে অনেক হইয়াছে। চল, ভূয়া দেশপ্রেমিক রেজিষ্ট্রেশন অফিসটি ভাঙ্গিয়া দিয়া আসি"। এই বলিয়া মুক্তিকামী শত শত হাজার হাজার হত দরিদ্র অনাহার ক্লিষ্ট মানুষ রেজিষ্ট্রেশন অফিসটি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য ডুদুক ছড়ার দিকে ধাবিত হইল। আর গরম গরম গণপিঠুনী খাইয়া বিলাস ও ভক্তিচান মাটিতে লুটোপুটি দিতে দিতে হাঁ হুঁ করিতে লাগিল।

কিশোর পাতা

প্রবন্ধ : জনতা আবার জাগবে-- মিঠুন চাকমা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; স্মৃতিতে ভাস্মর একটি দিন-- রূপন চাকমা, তিতুমীর কলেজ। **কবিতা** : জুম্ম জনতা-- তুন্ত মনি চাকমা, মধুপুর, খাগড়াছড়ি; মুক্তির সংগ্রাম-- বিক্রম চাকমা, দশম, ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা; প্রণব চাকমা, ঐ; নির্মল চাকমা, ঐ; যগার (আহ্বান)-- প্রজ্ঞাদীপ চাকমা, কাচলং শিশু সদন; রীতিময় চাকমা, ফটিকছড়ি ডিগ্রী কলেজ; দীন মোহন চাকমা, নান্যাচর ও লক্ষ্মীছড়ি থেকে এক নবীন বন্ধুর কবিতা এই বিভাগে এসেছে। আগামী সংখ্যা হতে পর্যায়ক্রমে এই লেখাগুলো ছাপা হবে। আগ্রহী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে লেখা পাঠানোর আহ্বান থাকলো-- *সম্পাদক*, কিশোর পাতা।

দৃষ্টি আকর্ষণ

[স্বাধিকার নিয়মিত বের করার জোর প্রচেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে স্বাধিকার বিক্রি বিক্রির কাজে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ, এজেন্ট, প্রতিনিধি পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও তিন সংগঠনের প্রতিটি কর্মীর সক্রিয় ও সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন। দ্রুত স্বাধিকার বিক্রি করে বিক্রিত লব্ধ অর্থ ডাক যোগে অথবা বিশ্বস্ত লোক মারফত "স্বাধিকার প্রকাশনা দপ্তর ৪৭০ জনগন্নাথ হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা" এই ঠিকানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।]

ঘটনা প্রবাহ

ঢাকায় হিল আর্টিষ্ট গ্রুপের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম চারুশিল্পীদের সংগঠন হিল আর্টিষ্ট গ্রুপ গত ২৫শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর পর্যন্ত নয় দিন ব্যাপী ঢাকায় প্রথম বারের মত এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ইন্ডিয়ান হাই কমিশন আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার দেব মুখার্জী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়।

প্রদর্শনীতে হিল আর্টিষ্ট গ্রুপের নয় জন শিল্পীর মোট ৫১টি শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে ধনমণি চাকমার ১০টি, মিতালী চাকমার ২টি, শুভংকর তালুকদারের ৯টি, রন্যাল চাকমার ৯টি, কেয়া চাকমার ৮টি, খগেন্দ্র ত্রিপুরার ৩টি, শেলী চাকমার ১টি, নাথান লানচেও'র ৪টি এবং নিমনি চাকমার ৬টি।

তাদের এইসব ছবিগুলোতে প্রধানত পাহাড়ীদের জীবন, পরিবেশ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতি তুলে ধরা হয়। শিল্পীরা তাদের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার মানুষকে দেখেছেন এবং রং তুলির মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

পাহাড়ীদের স্বতন্ত্র শিল্প,সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিশ্ব সমাজের কাছে তুলে ধরার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯২ সালের ১৫ই মার্চ হিল আর্টিষ্ট গ্রুপের জন্ম। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীটি গ্রুপটির তৃতীয় প্রদর্শনী। এর আগে তারা রাঙ্গামাটিতে ১৯৯২ ও ১৯৯৫ সালে দুই বার আয়োজন করেছিলেন। হিল আর্টিষ্ট গ্রুপের একজন শিল্পীর কার্টুন এক সময় রাডার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হতো এবং তা সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল।

হিল আর্টিষ্ট গ্রুপের সভাপতি ধনমুণি চাকমা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের লোক শিল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমরা চেষ্টা করবো আগামীতে এ নিয়ে কাজ করার। তাছাড়া, হিল আর্টিষ্ট গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা প্রতি বছর সম্ভব না হলেও দু'তিন বছর পর পর এভাবে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করার চেষ্টা করবো'।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ঢাকা শাখা গঠিত

গত ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ঢাকা শাখার ৪র্থ বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

সভানেত্রী রিপু চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি সঞ্চয় চাকমা ও বর্তমান সভাপতি দীপ্তি শংকর চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক কাহ্লাচিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কবিতা চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক উচিংমে মারমা প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন ইলিরা দেওয়ান।

বক্তাগণ পূর্ণস্বায়ত্তশাসন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, পাহাড়ী গণ পরিষদ ও ছাত্র পরিষদ থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত চক্রটি জনগণের মধ্যে নানান বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং জেএসএস -এর আদর্শচ্যুত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী চক্রটির সাথে জোগসাজসে আন্দোলনকে আপোষের কানাগলিতে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

নেতৃবৃন্দ মনে করেন, আপোষের মাধ্যমে জনগণের মুক্তি অর্জন হবে না। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন কায়েমের লক্ষ্যে আপোষহীন ধারায় সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

তারা আরও বলেন, জুম্ম জনগণের দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্য রয়েছে। জুম্ম জনগণ মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঠিকে ছিল। পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল। জুম্ম জনগণকে কেউ দমাতে পারবে না।

শেষে সুমিতা চাকমাকে সভানেত্রী, মেকি খীসাকে সাধারণ সম্পাদক ও রূপনা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ হতে বিতাড়িত ও আদর্শচ্যুত মুষ্ঠিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র নামধারী বখাটে ছেলে সম্মেলন ভন্ডুল করার ষড়যন্ত্র করলেও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের অকুতোভয় সংগ্রামী সহযোদ্ধারা দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে কাউন্সিল সুসম্পন্ন করে।

খাগড়াছড়িতে অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস পালিত

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা॥ গত ৩০শে অক্টোবর খাগড়াছড়িতে "অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস" পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে স্বনির্ভর এলাকায় একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি প্রদীপন খীসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন পিরিপি'র সাবেক কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিন্টু খীসা, পিসিপি কেন্দ্রীয় সদস্য ও জেলা কমিটির সহসভাপতি রিক্তন চাকমা, মধুপুর আঞ্চলিক শাখার সভাপতি তুন্ত মণি চাকমা, কলেজ কমিটির সর্বোত্তম চাকমা ও রিক্তন চাকমা।

বক্তারা বিগত সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিচালিত দমন পীড়ন নীতির তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা জনান। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের আমলেও সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চলছে বলে বক্তারা অভিযোগ করেন। সরকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বললেও পার্বত্য চট্টগ্রামে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বরং প্রশ্রয় দিচ্ছে। বক্তারা জাতীয় পার্টিও জামাতে ইসলামীর সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপেরও তীব্র সমালোচনা করেন। বিকেল চারটায় সমাবেশ হবার আগে একটি মিছিল রেড স্কোয়ার হয়ে স্বনির্ভর এলাকায় শেষ হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ৩০শে অক্টোবর পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘটের প্রস্তুতিকালে বিনা উস্কানীতে দাঙ্গা পুলিশ হামলা চালিয়ে শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে জখম করে। সে সময় পিসিপি'র তৎকালীন সভাপতি প্রসিত খীসাও আহত হন।

লাল রিজার্ভ বমের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বান্দরবান প্রতিনিধি॥ গত ২৬শে আগষ্ট পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখা ও বালাঘাটা কমিটির যৌথ উদ্যোগে লাল রিজার্ভ বমের ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বালাঘাটায় এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। থোয়াইসাংপ্রু মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন বালাঘাটা শাখার সভাপতি ছোটন তঞ্চঙ্গ্যা, বান্দরবান কলেজ কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সুফল চাকমা ও মংহাইচিং মারমা, বান্দরবান জেলা কমিটির সদস্য বিপ্লব চাকমা, উশৈচিং মারমা, সদস্য সচিব মংমংচিং মারমা, যুগ্ম আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় সদস্য শিশির তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন বালাঘাটা শাখার সাধারণ সম্পাদক মংপু মারমা।

সভার শুরুতে লাল রিজার্ভ বমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচকবৃন্দ বলেন, লাল রিজার্ভ বমের রক্ত কোনদিন বৃথা যেতে দেয়া হবে না। একমাত্র পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আন্দোলনের সকল শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে।

শহীদ বড়দাস মুণি'র ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

গত ১৩ই অক্টোবর ছিল শহীদ বড়দাস মুণির ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী। পাঁচ বছর আগে ঠিক এদিনে দিঘীনালার থানা বাজার এলাকায় সেনাবাহিনী ও বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের যৌথ হামলায় তিনি শহীদ হন। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কর্তৃক আহুত শান্তিপূর্ণ সমাবেশে যোগ দিতে আরো অসংখ্য মুক্তিকামী মানুষের তেজোদীপ্ত মিছিলে সামিল হয়েছিলেন ৭০ বছরের বৃদ্ধ বড়দাস মুণি। প্রৌঢ়ত্ব তাকে অন্ধকার ঘরের কোণে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। দাসত্ব ও নিপীড়ন নির্যাতনের শৃংখল থেকে মুক্তির জন্য তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে এসেছেন এবং অধিকারহারা মানুষের মুক্তির জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেই পর থেকে প্রতি বছর তার মহান আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ১৩ই অক্টোবর পালন করা হয়ে থাকে।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ঢাকা ও দিঘীনালাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যদায় জুম্ম জনগণের নিয়মতান্ত্রি আন্দোলনের প্রথম শহীদ বড়দাস মুণির মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

এই উপক্ষ্যে ঢাকায় বিকেল চারটায় তিন সংগঠন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে একটি শোক মিছিল বের করে এবং টিএসসি এলাকায় সমাবেশে সমাবেশ করে।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি দীপ্তি শংকর চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী গণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রসিত বি. খীসা, অর্থ সম্পাদক দেবাশীষ চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক প্রমেশ্বর চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক ইলিরা দেওয়ান ও ঢাকা শাখার সভানেত্রী সুমিতা চাকমা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি সঞ্চয় চাকমা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পিসিপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক ক্যহ্লাচিং মারমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পূর্ণস্বায়ত্তশাসন মেনে না নিয়ে কোন ধরনের চুক্তি হলে তিন সংগঠন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ তা মেনে নেবে না। জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যাবে না। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামাতসহ দেশের চরম দক্ষিণপন্থী দল সংগঠনগুলো বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এদের বক্তব্যে বিভ্রান্ত হবেন না।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ব্যাপক জুম্ম ছাত্র সমাজ বর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও পিসিপি থেকে বহিষ্কৃত কতিপয় বখাটে ছেলে আপোষকামীদের সাথে মিলে জুম্মদের মধ্যে নান ধরনের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তারা আন্দোলনরত তিন সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের ওপর সেনাবাহিনী ও সরকারের পক্ষ হয়ে হামলা করছে। জনগণের ওপরও তারা চড়াও হয়েছে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন নেত্রী ইলিরা দেওয়ান বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির কথা বলে, সমাধানের কথা বলে, অথচ অপহৃত কল্পনা চাকমার তদন্ত রিপোর্ট এখনো প্রকাশ করেনি।অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এখনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। তিনি অবিলম্বে অপহৃত কল্পনা চাকমার তদন্ত রিপোর্টসহ সকল হত্যার তদন্ত ও রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানান।

পাহাড়ী গণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বলেন, জুম্ম জনগণ শান্তি চাই। কিন্তু জোর জবরদস্তি করে, ষড়যন্ত্র করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোন সমস্যার সমাধান হয় না। তিনি ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, জনগণের দাবি পূরণ না করে কোন চুক্তি হলে তাতে ঐ ভার্সাই চুক্তির মতো অশান্তির বীজ লুকিয়ে থাকবে। ইতিমধ্যেই মস্তান,বাটপার ও মুখোম বাহিনী বীরদর্পে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে জনগণের প্রাণপ্রিয় দাবি পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে। পাহাড়ীদের ভূমি অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। সেনাবাহিনী ও বহিরাগতদের ফিরিয়ে আনতে হবে।

সভাপতির ভাষণে দীপ্তি শংকর চাকমা বলেন, জুম্ম জনগণের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম শহীদ বড়দাস মুণি জনগণের স্বপ্ন পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানী করা যাবে না।

চুক্তি পাগল আপোষকামী সংগঠন জনসংহতি সমিতির উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জুম্ম স্বার্থরহিত শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ইতিহাসে কলংকিত হয়ে থাকবেন না। আপোষের কানাগলিতে আন্দোলনকে নিয়ে যাবেন না। জনগণের কাছ থেকে আন্দোলনের শিক্ষা নিন। তিন সংগঠন আন্দোলনের পথ ও মত সম্পর্কে বিতর্ক চালাতে প্রস্তুত আছে।

একইদিন খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালাতেও তিন সংগঠনের উদ্যোগে বড়দাস মুণির মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

গণপরিষদ নেতা কিরণ মারমার ভূমি বেদখল

পানখাইয়া পাড়া সড়কের কল্যানপুর পাড়ার দক্ষিণ পার্শ্বে পাহাড়ী গণ পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য কিরণ মারমার জায়গা বহিরাগত বাঙালিরা জবরদখল করে রেনেসাঁ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ঘটনার পেছনে জেলা আওয়ামী লীগের জনৈক প্রভাবশালী নেতার ইন্ধন রয়েছে বলে জানা গেছে। আগে ঐ জায়গায় আর্মির টহল পোষ্ট ছিলো। অনুমতি নিয়েই আর্মিরা তা স্থাপন করেছিল।

কিরণ মারমা এ ব্যাপারে প্রশাসনকে অবগত করলেও কোন কাজ হয়নি। উল্লেখ্য, কিরণ মারমা আগে পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।

দুই নাম্বারী বখাটেদের কান্ড

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা॥ গত ৮ই অক্টোবর নারাঙহিয়া রেড স্কোয়ারস্থ এলজিইডি অফিসে সদ্ভ লারমার ভাড়াটে গুন্ডা দুই নাম্বারীরা টাকার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে মারামারি করে।

শহীদ বড়দাস মুণি দিবস পালনের নামে এরা পূর্ব ও পশ্চিম নারাঙহিয়া থেকে চাঁদা উত্তোলন করে। যানবাহন থেকেও চাঁদা সংগ্রহ করে। শহীদ বড়দাস মণির নামে উত্তোলিত এই টাকার ভাগ বাটোয়ারা নিয়েই তাদের মধ্যে মারামারি হয়।

আপোষ নয়, আসুন লড়াই

১ম পাতার পর

মাধ্যমে। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থা ও মালিকানার ধরণ সমতল এলাকা থেকে আলাদা, সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন অপর্যাপ্ত। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার সমাধান করতে গেলে পাহাড়ীরা নিজেদের জমিও হারাবেন।

সাংবিধানিক গ্যারান্টি না থাকার কারণে আঞ্চলিক পরিষদ বা পার্বত্য পরিষদ, যে নামেই অভিহিত করা হোক, তা যে কোন সরকার যে কোন সময় সংসদে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে কিংবা রাষ্ট্রপতির আদেশবলে বাতিল করতে পারে। যেমনটি হয়েছিল এরশাদ শাহীর পতনের পর। রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদ সে সময় দেশের ৬১টি জেলা পরিষদ বাতিল করে দিয়েছিলেন। এদিক দিয়ে এরশাদ আমলে '৮৯ সালের জেলা পরিষদের সাথে এর মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

জনগণের দাবি অর্জিত না হওয়া সত্বেও জেএসএস কেন সরকারের সাথে সমঝোতা করতে যাচ্ছে? কাদের স্বার্থ ও কাদের মনোবাসনা পূরণ আর কাদের খায়েস মেটানোর জন্য আপোষ-চুক্তি হতে যাচ্ছে?

জেএসএস -এর আপোষকামী সুবিধাবাদী অধঃপতিত নেতৃত্ব জনগণকে ভুলিয়ে রাখার জন্য নানান বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় মেতে উঠেছে। খসড়া চুক্তি সম্পর্কে অহেতুক মিথ্যা মোহ সৃষ্টির জন্য এমন ভাবসাব দেখানো হচ্ছে, যেন চুক্তির খসড়ায় জনগণের অস্তিত্বের জন্য বি-রা-ট কিছু রয়েছে! তাতে এমন যাদুকরী জিনিস রয়েছে যা জেএসএস জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারছে না। কিন্তু এটাই বলছে ঐ চুক্তিতে আছে একটা কিছু। তবে সেই একটা কিছুর ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা যাবে না। ব্যাখ্যা চাওয়া যাবে না। কোন কিছু বলাও যাবে না। শুধু চোখ বুঁজে একান্ত অনুগত বাধ্যগত ছাত্রের মত বিনা বাক্য ব্যয়ে অবনত মস্তকে তা মেনে নিতে হবে।

জেএসএস -এর এ ধরনের কান্ড কারখানা একটি সত্য ঘটনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। কখনো কখনো সত্য ঘটনা গল্পের চাইতেও অদ্ভুত মনে হয়। ঘটনাটি ঘটেছিল খোদ রাঙামাটি সদরে। সে প্রায় বছর দশেক আগে। রাঙামাটিতে মশার উপদ্রবের কথা সবার জানা। স্বভাবতই মশার ওপর বিরক্ত লোকজন যে কোন মূল্য দিয়ে বিহিত ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত। রাঙামাটি লোকদের এই মনস্তাত্বিক দুর্বলতা বুঝে চট্টগ্রামের এক ভণ্ড প্রতারক টু পায়েস কামাবার মতলবে তথাকথিত মশার ঔষধ বিক্রি করতে যায়। রাঙামাটি গিয়ে এমন ধরনের ক্যানভাস শুরু করে দেয় যে মশা নিধনে তার রয়েছে অব্যর্থ ঔষধ। স্বাভাবিকভাবে রাঙামাটিতে হুলস্থুল কাণ্ড পড়ে যায়। মশার ঔষধ সংগ্রহ করতে সবাই হুড়মুড় খেয়ে পড়ে। ঔষধের দামও বেশী নয়। মাত্র দু' টাকা। অল্প দামে ভয়ানক কার্যকরী ঔষধ, কাগজে মোড়া ছোট একটি প্যাকেট। ভণ্ডটি মুখে ফেনা তুলে ঔষধের ব্যবহার বিধি বর্ণনা দিয়ে সতর্ক করে দেয়, রাত্রে ঘুমোবার আগ পর্যন্ত ঔষধটি খোলা যাবে না। না হলে গুণাগুণ নষ্ট হবে, কার্যকারীতা থাকবে না। সস্তায় ঔষধ কাড়াকাড়ি করে কিনে সবাই বাড়ি ফেরে। ভণ্ড ঔষধ বিক্রেতার কথামত সরল বিশ্বাসে কেহই দু' টাকার ঝুঁকি নিয়ে প্যাকেটটি খুলে দেখার দূরদর্শীতা দেখাতে পারেনি। যথারীতি রাতে ঘুমোবার আগে প্যাকেট খুলে দেখে আজব কারবার ! কোথায় সে ঔষধ! প্যাকেটটার ভিতরে শুধু একটা কথাই লেখা আছে "মশার ঔষধ মশারী"। সেদিন মশার নিধন যজ্ঞে প্রস্তুত (নতুন কেনা অস্ত্রে সুসজ্জিত!) গোটা রাঙামাটিবাসী বোকা বনে যায়। আর ভণ্ড ঔষধ বিক্রেতা ততক্ষণে রাঙামাটি ছেড়ে লাপাত্তা।

পাহাড়ীদের এই অনুসন্ধিৎসাহীন সারল্যতা এক ধরনের বোকামীই। তার খেসারত সেদিন যেমন মশার ঔষধ কেনার মাধ্যমে দিতে হয়েছিল, বর্তমান কালেও দেখে শুনে চলতে না পারলে বোকামীর খেসারত জনম জনম দিতে হবে। জেএসএস -এর বহুল প্রচারিত "একটা কিছু" সংযুক্ত চুক্তির খসড়াও ঐ ভণ্ডটির ভূয়া মশার ঔষধের মতো কিনা সে সন্দেহই থেকে যায়।

জনগণের ভাগ্য ছেলে হাতের মোয়া নয়। এ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারোর নেই। সরকারের টোপ গিলে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যে এতদিনের গড়ে ওঠা আন্দোলন কানাগলিতে ঠেলে দেবার ষড়যন্ত্র জনগণ প্রতিহত করবে। ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করে দুনিয়ায় কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামেও হবে না। এ সত্যটুকু না বুঝে যারা গণশত্রুদের সাথে কোলাকুলি করে আন্দোলন সংগ্রাম নস্যাৎ করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সময় এসেছে। দেশ ও জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য লড়াই সংগ্রাম করার সাহস যাদের আছে তারা এগিয়ে আসুন। সমস্ত ধরনের ষড়যন্ত্র প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে একই পতাকাতলে সমবেত হোন। আপোষের কানাগলি নয়, লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হোন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যে সব দেশপ্রেমিক সংগ্রামী বন্ধুরা লড়াইয়ের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে প্রস্তুত -আসুন সেই বন্ধুরা মিলে সত্যিকার আন্দোলন সংগ্রামের পথ রচনা করি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তিকামী সংগঠন ও ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে শুভেচ্ছার হাত প্রসারিত করে রেখেছে।

"শান্তি চুক্তি থেকে পাহাড়ীদের

জেএসএস ক্ষমতায় কিছু ভাগ পাবার জন্য চুক্তি করছে। শাসক গোষ্ঠীর জুনিয়র পার্টনার হওয়ার জন্য তারা চেষ্টা চালাচ্ছে। যুদ্ধ বিরতির নামে তারা আন্দোলন পরিহার করেছে। সশস্ত্র পন্থার সংগ্রামকে স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের অন্যান্য ফরমও তারা ব্যবহার করেছে না। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে ও অন্যান্য ফ্রন্টে কাজ হতে পারতো, জনগণের রাজনৈতিক মান বাড়ানোর জন্য এবং বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করার কাজ হতে পারতো। কিন্তু তা তারা করেনি এবং এখনও করছে না।

ফয়জুল হাকিম লালা বলেন, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামাত শান্তি চুক্তির বিরোধীতার নামে আওয়ামী লীগের হাতকেই শক্তিশালী করছে। পাহাড়ী জনগণের ওপর যে নির্দয় নিপীড়ন নির্যাতন চলছে এই দলগুলোও তার সাথে যুক্ত। আওয়ামী লীগ নামের যে দলটির প্রধান শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির কথা বলছে, সে দলটিরই তৎকালীন নেতা শেখ মুজিবর রহমান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে জাতীয় পরিচয় ভুলে গিয়ে বাঙালি হয়ে যেতে বলেছিলেন। কাজেই যে শান্তির কথা বলা হচ্ছে তা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে বিএনপি চুক্তির বিরোধীতার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, পাহাড়ী বাঙালি উভয় জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হতে পারে না। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের মুক্তি সমগ্র দেশের আপামর জনগণের মুক্তি ছাড়া আলাদাভাবে অর্জিত হতে পারে না।

সভাপতির ভাষণে বদরুদ্দীন উমর বলেন, কাদের মধ্যে শান্তি হচ্ছে তা বোঝা যাবে এই শান্তি প্রক্রিয়া কিভাবে শুরু হয়েছে এবং তার পরিণতির দিকে তাকালে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে আন্দোলন চলছে সরকার তা চুক্তি করে বন্ধ করতে চাইছে, যাতে পরে আন্দোলন হলে বলতে পারে যে সেখানে শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে। কাজেই এই চুক্তি থেকে পাহাড়ীদের পাওয়ার কিছু নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান সমস্যা ভূমি। এটা বেদখল হয়ে আছে। এই ভূমি সমস্যা সারা বাংলাদেশের সামগ্রিক ভূমি সমস্যার বাইরে নয়। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা দেশের সামগ্রিক সমস্যার সমাধান না করে সম্ভব নয়। বর্তমানে উভয় জনগণের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতের আন্দোলন উভয় জনগণের মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনা করতে হবে।

রাজনীতি যখন পাঞ্জাবী থেকে

২য় পাতার পর

পারেন না বলেই এদেশের রাজনীতিকরা রাজনৈতিক ওম প্রদান করেন। তাই আশা করা যায় এই শীত মৌসুমে পার্বত্য রাজনীতিও কিছুটা গরম হবে। এবং এও আশা করা যায় যে হাসিনা পাঞ্জাবীর পরিবর্তে এবার ভারী একটা কিছু উপহার দিয়ে ফাইনাল খেলাটি খেলবেন। 'ফলপ্রসূ ডিপ্লোমেসী' ও 'পাঞ্জাবী কূটনীতি' একাকার হয়ে চুক্তি প্রসব করে শেষ হয় এবং পাঞ্জাবী কূটনীতির পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে হাসিনা বিবি সন্তু বাবুকে কম্বল উপহার দিয়ে "কম্বল কূটনীতি" শুরু করবেন। পাঞ্জাবীটাতো শুধু একজনের গায়েই লাগে, কম্বল দিয়ে সন্তু রাবু আরো কয়েকজনকে জড়িয়ে ধরতে পারবেন। যারা সংগ্রাম করতে অস্ত্র ধরেছে, কম্বল দিয়ে তাদের চোখ মুখ ঢেকে দিতে পারবেন। বেশ, আর চায় কি? এখানেইতো কম্বল কূটনীতির মহিমা। তবে ঐ কম্বল গোটা জেএসএস -এর সদস্যদের ঢেকে রাখতে পারবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাড়ে ছয় লাখ মানুষকে রাখারতো প্রশ্নই আসে না। এর পর পরিস্থিতি হবে ভিন্ন। কম্বলের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে অনেকে। এই শীত মওসুমে কম্বলের ওম নেবার কাড়াকাড়ির খেলায় কে বেশী পারদর্শী তা প্রমাণের জন্য সন্তু লারমা, গৌতম দেওয়ান, দীপংকর, কল্প, ও জেরীর মধ্যে শুরু হবে প্রতিযোগীতা। এ ফাইন্যাল খেলায় যে দেশ জাতির স্বার্থ যত বেশী বিকিয়ে দিয়ে বেশী হাসিনার মনোরঞ্জন করতে পারবে; সেই পাবে কম্বল। এই নোংরা খেলায় অতিষ্ঠ ও বঞ্চিত জনতা তখন আবার মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে মিছিলে মিছিলে রাজপথ প্রকম্পিত করবে ঃ আগুন জ্বালো., আগুন জ্বালো, আপোষনামায় আগুন জ্বালো। জাত বিক্রির আপোষ-চুক্তি, জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও। আদম বেপারীদের গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে। পাঞ্জাবী কম্বল লাথি মারো, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ো।

সন্ত্রাসী দুই নাম্বারী কর্তৃক হুয়াঙ বোইও বা'য় হামলা

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা॥ গত ৮ই সেপ্টেম্বর সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ির স্বনির্ভরস্থ হুয়াঙ বোইও -বা'তে (একটি বেসরকারী পাঠাগার) হামলা চালায়। তারা সেখানে ব্যাপক ভাঙচুর করে, বইপত্র পুড়িয়ে দেয় এবং মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে প্রকাশ, ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে রূপক চাকমার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী চাইনিজ কুড়াল, কিরিচ, লোহার রড ও লাঠিসোটাসহ হুয়াঙ বোইও বা'র অফিসের তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে এবং সেখানে রক্ষিত চেয়ার, টেবিল, বুকসেলফ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। বহু কষ্টে সংগৃহীত অনেক দূর্লভ বইপত্র ম্যাগাজিন ও অফিসের কাগজপত্রাদি বাইরে এনে পুড়িয়ে দেয়। আরও ২ শতাধিক বই, ৮টি ফোল্ডিং চেয়ার, ২টি লোব্যাক চেয়ার ও ৬টি কাঠের চেয়ার লুট করে নিয়ে যায়। এছাড়া অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা ৪নং ইউনিয়ন পরিষদের কার্য্যালয়েও রক্ষিত চাউল লুট করে নিয়ে যায় এবং ক্ষতিসাধন করে।

ঘটনায় জড়িত অন্যান্য সন্ত্রাসীরা হলো আশিষ চাকমা (নারাঙহিয়া), টক্কুলু চাকমা (অনুত্তর, খবংপুজ্যা), অতীন দেওয়ান (নারাঙহিয়া), পরাণ্যা চাকমা (নারাঙহিয়া), বাবু চাকমা (রিপন, খবংপুজ্যা), পুলক চাকমা (নারাঙহিয়া), জকী চাকমা (নারাঙহিয়া) ও জন্তান চাকমা (নারাঙহিয়া) সহ আরে অনেকে। গত ৯ই সেপ্টেম্বর উপরোল্লেখিত সন্ত্রাসীদের দায়ী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রশাসনের তরফ থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সন্ত্রাসীরা এখনো দোর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং প্রতিদিন নানা অঘটন ঘটিয়ে এলাকাবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। মদ, জুয়া,হিরোইন ইত্যাদিতে আসক্ত এই সন্ত্রাসীরা আরও নানান অসামাজিক কাজে লিপ্ত এবং তাদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানাও জারী রয়েছে। প্রশাসন এসব দেখেও না দেখার ভাণ করছে এবং পরোক্ষভাবে এসব ঘটনার উস্কানী দিচ্ছে।

উপরোল্লেখিত সন্ত্রাসীদের দু'একজন বিভিন্ন সময় ডুদুকছড়ায় গিয়ে তাদের গডফাদারের সাথে দেখা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও কাড়ি কাড়ি টাকা নিয়ে আসে। আশিষ চাকমা সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আলোচনায় সাহায্যের জন্য গঠিত স্বেচ্ছাসেবী দলের সদস্য।

লংগদুতে বহিরাগতদের হামলায় ৬ জুম্ম আহত

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ৯ই সেপ্টেম্বর লংগদুর ৩নং বগাচত্তর ইউনিয়ন পরিষদের অধীন বৈরাগী বাজারে রিলিফ চাউল আনতে গেলে মাঝ পথে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীরা ৬ জন পাহাড়ীর উপর হামলা চালিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে। এরা হলেন, কালামিলা চাকমা স্বামী কাল্যা চাকমা, কালা বাংকু চাকমা পীং কমলেশ্বর চাকমা, ক্ষেত্র মোহন চাকমা পীং পবন চন্দ্র চাকমা, বিমল কান্তি চাকমা পীং ধীরেন্দ্র চাকমা, জগল লাল চাকমা পীং কালী চরণ চাকমা ও ননা রাম চাকমা পীং ধীরেন্দ্র চাকমা।

পরে ২১শে সেপ্টেম্বর থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনার তদন্ত করতে যান। তার কাছে পুরো ঘটনার বর্ণনা দেয়া হলেও তিনি এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি।

দুই নাম্বারীদের কর্তৃক নবপরিণীতা বধূ ধর্ষিতা

গত ২২শে সেপ্টেম্বর রাত দশটা এগারটার দিকে নারাঙহিয়ার রেড স্কোয়ার নামক স্থানে দুই নাম্বারী বখাটেদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছে। মেয়েটি নববিবাহিতা, সিঙ্গিনালায় দাওয়াত খেয়ে পানখাইয়া পাড়ায় ফেরার পথে রেড স্কোয়ার নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। দুই নাম্বারীরা রিক্সা থেকে মেয়েটিকে নামিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালায়। মেয়েটির স্বামী নিরাপত্তাবাহিনীতে চাকুরীরত বলে জানা গেছে। সে লজ্জা ও ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না।

উল্লেখ্য, পিসিপি'র নেতাকর্মিদের গতিবিধি নজর রাখার জন্য সন্তু লারমা বখাটে ছেলেদের নিযুক্ত করেছে। এদেরকে প্রচুর কালো টাকা, মদ ও ফেনসিডিল বিলিয়ে দিয়ে সমাজ ও জাতি রসাতলে নেয়ার ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে উঠেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিপূণ সহাবস্থান, সমঅধিকার ও অন্যান্য প্রসংগ

-মানবমিত্র

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য বর্তমানে নানা চক্রান্ত চলছে। বিভ্রান্তির নানান ধুম্রজাল সৃষ্টি করা হচ্ছে। খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী গত ১৫ই অক্টোবর খাগড়াছড়িতে একটি সমাবেশে জনতাকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, পাহাড়ী বাঙালী উভয় সম্প্রদায়কে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে হবে। বেগম মতিয়া চৌধুরী কাকে উপদেশ দেন? কাকে কি শেখাতে চান? জনগণকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শেখাবেন না। আপনাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অর্থ কি পার্বত্য জনগণ তা ভালো করে জানে। পাহাড়ীদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকিয়ে, তাদেরকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করার পর এবং এইসব বাঙালিদের দিয়ে পাহাড়ীদের জমি কেড়ে নেয়ার পর এখন আপনারা শান্তির উপাসক সেজেছেন আর পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গালভরা উপদেশ বর্ষণ করছেন। জমি আর সহায় সম্বল হারানোর ব্যথা নিয়ে কোন লোকের পক্ষে তার জমির দখলকারীর সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান যৌক্তিক কারণেই অসম্ভব। মতিয়া চৌধুরী ও সরকারের অন্যান্য দায়িত্বশীলদের এই ধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপদেশ এক ধরনের চালাকি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। বহিরাগতদের দ্বারা ইতিমধ্যে বেদখলকৃত জমির দখল সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার জন্যই তাদের এই কৌশল। কোন কিছু দখলের পর বা উদ্দেশ্য হাসিলের পর বিজয়ী পক্ষ সাধারণতঃ এ ধরণের পদক্ষেপের আশ্রয় নেয়। আফগানিস্তানে তালিবানরা যেমনটি রাজধানী কাবুল দখল করার পর তাদের অবস্থান সংহত করার জন্য প্রতিপক্ষের সাথে শান্তির প্রস্তাব দিয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামেও আমরা হরহামেশা এই ধরনের চালাকি দেখতে পাই। যেমন, রাঙ্গামাটিতে ৯২ সালে কয়েক ঘন্টা ধরে পাহাড়ীদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার পর এবং বান্দরবানে ১৯৯৫ সালে মারমাদের গ্রামে হামলা ও অগ্নিসংযোগের পর প্রশাসন শান্তির বাণী প্রচার করতে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়ে। শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটে তখন তাদের যেন কোন কর্তব্যই নেই। তখন তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। অবশ্য-তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব থাকার কথা নয়। কারণ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। প্রতিপক্ষের ধুমায়িত ক্ষোভ ও বিক্ষোভকে মিইয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের শান্তি কমিটি গঠন করা হয়।

কাজেই যতই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলা হোক না কেন, হারানো জমি ফিরে না পেলে, জানমালের নিরাপত্তা না হলে, অস্তিত্ব সংরক্ষণের গ্যারান্টি না থাকলে এবং আবার উচ্ছেদ হওয়ার আশংকা থাকলে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বাস্তব সঙ্গত কারণেই সম্ভব হবে না।

আমরা অবশ্যই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান চাই। আমরা বেগম মতিয়া চৌধুরী ও এ সরকারের কর্তাব্যক্তিদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সুদূর অতীত থেকে পাহাড়ী ও বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে আসছিল। এ ধরণের ঐতিহ্য অনেক পুরোণো। কিন্তু যখনই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে তাদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপন করা হয়, তাদেরকে তথাকথিত কাউন্টার ইন্সার্জেন্সির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং সর্বোপরি তাদেরকে দিয়ে পাহাড়ীদের জমি জবর দখল করা হয়,- তখনই পারস্পরিক সহাবস্থানের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে এক সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তাদের মধ্যে কৃত্রিম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে শাসক গোষ্ঠী তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করেছে। কাজেই এটা পরিষ্কার যে, যে সকল কারণে উভয় সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহাবস্থানের পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে, সে সকল কারণকে দূরীভূত করলেই অবস্থার উন্নতি হতে বাধ্য। এজন্য আর উপদেশমালা বর্ষণের প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া এ কথাও বলা দরকার যে, সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পুরোণবস্তি বাঙালিদের সাথে পাহাড়ীদের কোন জাতিগত বিরোধ নেই। অতীতে এবং বর্তমানেও তাদের মধ্যে সংঘর্ষের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

এখানে বলা হচ্ছে যে, দলিল বা ভূমির রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করে মালিকানা প্রমাণ করতে পারলে পাহাড়ীদের বেদখলকৃত জমি দেশের প্রচলিত আইনে ফিরিয়ে দেয়া হবে। প্রথমতঃ বলা প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে চার লক্ষাধিক বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়, তাদের দ্বারা পাহাড়ীদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমি বেদখল হয়েছে। সেই জন্য পাহাড়ীদের জমি ফিরে পাওয়ার সাথে বহিরাগতদের প্রত্যাহারের সম্পর্ক রয়েছে। পাহাড়ীদের জমি ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়টি একটি রাজনৈতিক বিষয়। শুধুমাত্র প্রচলিত আইনে ভূমি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। যদি তাই হতো তাহলে প্রত্যাগত শরণার্থীদের জমি ফিরে পেতে কোন অসুবিধা হতো না। জুম্মদের ভূমি অধিকার ফিরিয়ে না দিয়ে শুধুমাত্র ভূমি কমিশন গঠন করেও সমস্যার সমাধান আশা করা যায় না।

ইদানিং অনেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী বাঙালি সমঅধিকারের কথা বলে বিষয়টিকে ঘোলাটে ও কুয়াশাচ্ছন্ন করছে। এরা বিষয়টি উপস্থাপন করছে অন্যভাবে। তারা বলতে চায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের সমঅধিকার নেই। কিন্তু বাস্তব কি তাই? পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণইতো সমঅধিকার ও জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতির জন্য দীর্ঘ দু' দশকের বেশী সময় ধরে সংগ্রাম করে আসছে। জুম্মরাইতো তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। পাহাড়ী বাঙালির সমঅধিকার একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই স্বায়ত্তশাসন শুধু মাত্র বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এ স্বায়ত্তশাসন পাহাড়ী বাঙালি নির্বিশেষ সবার জন্য।

কিছু কিছু সংগঠন ও ব্যক্তি বিশেষ সমঅধিকারের ধুয়ো তুলছে তাদের অন্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। তাদের সমঅধিকার হচ্ছে বাস্তবতঃ পাহাড়ীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার অধিকার, তাদের জায়গা জমি বেদখল করার অধিকার, তাদের ওপর দমন পীড়ন চালানোর অবাধ অধিকার।

ইদানিং বিএনপি, জামাত, জাতীয় পার্টি বাঙালি স্বার্থ বাঙালি স্বার্থ বলে মায়াকান্না করছে। অবশ্য আওয়ামী লীগও এ দিক দিয়ে কম যায় না। বস্তুতপক্ষে এ রাজনৈতিক দলগুলোই সবচেয়ে বেশী বাঙালিদের স্বার্থ হরণ করছে। তারা নিজেদের গোষ্ঠী স্বার্থকে বাঙালি স্বার্থ বলে চালিয়ে দিতে চাইছে। এই দলগুলো বাঙালি স্বার্থ, দেশের স্বার্থ বলে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে কি করেছে এবং বর্তমানে কি করছে তা জনগণ জানে। জামাতে ইসলাম কোন মুখে বাঙালি স্বার্থের কথা বলতে পারে? তারা কি মনে করে যে এদেশের জনগণ তাদের অতীত অপরাধ ভুলে গেছে? তারা কি এদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানিদের সহায়তা করেনি? তারা কি হাজার হাজার নিরীহ বাঙালিকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে শত্রুদের সহায়তা করেনি? এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিশ্চিহ্ন করেনি? আর স্বৈরাচারী এরশাদের কথাতো বাদই দেয়া যেতে পারে। জাতীয় পার্টি ছাড়া বিএনপি, আওয়ামী লীগও -এই দেশটি শাসন করেছে। তারা কি এদেশের স্বার্থ রক্ষা করছে? এই সব দলগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় বাঙালি বাঙালি বলে চিৎকার করলেও সারা দেশে কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের ওপর প্রতিদিন জোর জুলুম চালাচ্ছে। তারা আন্দোলনরত কৃষককে হত্যা করেছে। শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন চালায়। বুলডোজার দিয়ে বস্তিবাসীদের আবাস গুঁড়িয়ে দেয়। তাদের ঘরবাড়ি মস্তান গুন্ডা দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। নারায়ণগঞ্জে সেনাবাহিনী সাধারণ গ্রামবাসীদের ওপর মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্যাতন চালিয়েছে বিনা কারণে। সারা দেশকে তারা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের ওপর দমন পীড়ন চালানোর জন্য এবং সেখানে শাসন শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য সাধারণ বাঙালিরা হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। শাসক গোষ্ঠী নিজেদের হীন স্বার্থে দুই ভ্রাতৃপ্রতিম জনগোষ্ঠীকে সংঘর্ষের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, আর মাঝখানে তারা নিজেদের ফায়দা লুফে নিচ্ছে।

এইসব বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি ও অন্যান্য লোভ দেখিয়ে নেয়া হলেও, সরকার তা দিতে পারেনি সঙ্গত কারণেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষের জন্য বাড়তি কোন জমি নেই, যদিও আয়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের এক দশমাংশ। তাই সরকার তাদেরকে পাহাড়ীদের জমি দখল করতে উস্কানি দেয়। প্রশাসনিক, আইনগত এবং এমনকি সামরিক সাহায্যও এই জমি বেদখলের কাজে দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপনের পর থেকে বাঙালিদেরকে রেশন দেয়া হচ্ছে। তারা এখনও সরকারী রেশনের ওপর নির্ভরশীল, কারণ তাদেরকে জমি দেয়া সম্ভব হয়নি। কই, দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এত অসংখ্য হতদরিদ্র বাঙালি রয়েছেন তাদের জন্যে তো সরকার এভাবে রেশন বরাদ্দ করে না। তাদেরকে যে রেশন দেয়া হয় এজন্য আমাদের কোন হিংসা থাকার কথা নয়। কিন্তু একথা বলে এটুকু বোঝানো হচ্ছে যে, বসতিস্থাপনকারী বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে রাখার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে, তা দিয়ে শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে তাদেরকে সমতলে অনায়াসে পুনর্বাসন করা সম্ভব। বছরের পর বছর শুধুমাত্র রেশন দিয়ে ৪লক্ষ লোককে পুষিয়ে রাখার সুগভীর উদ্দেশ্যও তাতে ধরা পড়ে। আমরা চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদেরকে শাসক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার অচিরেই বন্ধ হোক। তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে সমতলে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন দেয়া হোক।

বিরোধী দলগুলোর পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে হৈ চৈ শুরু হলে প্রধানমন্ত্রী তার সাম্প্রতিক বক্তব্যগুলোতে সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না। গত ১৫ অক্টোবর মতিয়া চৌধুরীও খাগড়াছড়িতে গিয়ে একই কথা বলে এসেছেন। আমরা বুঝতে পারি না, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী ও বসতিস্থাপনকারীদের ফিরিয়ে না এনে কিভাবে সরকার ও শান্তি আলোচনাকারীরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। শান্তি যদি প্রতিষ্ঠিত হয়েই থাকে, শান্তিবাহিনী যদি অস্ত্র সমর্পন করে থাকে, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী রাখার দরকার কি? কার সাথে তারা যুদ্ধ করবে? সেনাবাহিনী নিজেরাই বলছে যে, তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকতে চায় না। তারা ক্লান্ত। আসলে আজ সাধারণ সিপাহী থেকে শুরু করে সবাই বুঝতে পারছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী একটি অন্যায় যুদ্ধ চালাচ্ছে। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নয়, তারা দেশের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে নিজের ভাইয়ের বুকে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই জাতীয় অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে বেশীদিন বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়। অতীতে যে সব সেনা কর্মকর্তা পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্দয় দমন পীড়ন চালিয়েছে, তারা এখন অনুতপ্ত। কৃত অপরাধের জন্য একদিন সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। পাঞ্জাবের জালিয়ান ওয়ালাবাগে বৃটিশরা যে হত্যাকান্ড সংঘটিত করে তার জন্য তাদেরকে দেড় 'শ বছর পর দুঃখ প্রকাশ করতে হচ্ছে। জাপানকেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে হচ্ছে। এদেশের বিবেকও একদিন জাগরিত হবে। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন সবাই শান্তির জন্য উন্মুখ। সরকার ও জনসংহতি সমিতি অচিরেই একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে বলে দেশবাসীকে জানানো হয়েছে। কিন্তু আমরা উভয় পক্ষকে এবং সর্বোপরি দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে চায় যে, যে সকল উপাদান বা কারণ অশান্তির মূল কারণ সেগুলো সমূলে উৎপাটন না করে চুক্তি করা হলে এবং তার নাম শান্তিচুক্তি বলা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসার কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না। সেটা ইতিহাসে এক কালো দলিল, চরম অশান্তির দলিল হিসেবে থাকবে। তাই সাবধান!

মাইচছড়ি বাজার আবার চালু

দীর্ঘদিন বয়কটের পর গত ১১ই অক্টোবর মহালছড়ি থানাধীন মাইচছড়ি বাজার আবার চালু হয়েছে। উল্লেখ্য, ঐতিহ্যবাহী ফুল বিঝুর দিন গেল ১২ই এপ্রিল বাজারে কেনাকাটায় ব্যস্ত পাহাড়ীদের উপর বহিরাগত ও স্থানীয় বাঙালিরা সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এতে বহু নিরীহ পাহাড়ী জখম হয়। তারপর থেকে এলাকার পাহাড়ীরা পাল্টা বাজার প্রতিষ্ঠা করে। নিজেরা বাজার পরিচালনা কমিটি গঠন করে। এতে প্রশাসন, ব্যবসায়ী ও বাজারের দোকানদারদের টনক নড়ে। তারা বহু ছলা কলায় মাইচছড়ি বাজারে জুম্মোদের নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। হামলাকারীদের বিচারের দাবীতে অটল এলাকাবাসী ঐ ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেয়নি।

১১ই অক্টোবর বাজার খুলে দেবার পেছনে শান্তিবাহিনীর কতিপয় ব্যক্তির হাত রয়েছে বলে গোপন সূত্রে জানা গেছে। শান্তিবাহিনীর আরডি (আঞ্চলিক পরিচালক) শুভাকরকে মাইচছড়ি বাজার কমিটি দু'লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছে বলে সূত্রে প্রকাশ। এ ঘটনায় এলাকায় নানান কথাবার্তা উঠছে।

বিজ্ঞপ্তি

সবকিছু প্রস্তুত থাকা সত্বেও বিশেষ কারণে এ সংখ্যায় কিশোর পাতা ও সংগ্রামের ডায়েরী প্রকাশ করা সম্ভব হলো না বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। পরবর্তী সংখ্যা থেকে যথারীতি প্রকাশ করা হবে। এই দু'টো বিভাগে লেখা পাঠানোর আহ্বান রইল। -সম্পাদক মন্ডলী

পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রচার ও প্রকাশনা দপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত স্বাধিকার সম্পাদক মন্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।